প্রযুক্তি বুকলেট

ভেড়া পালন

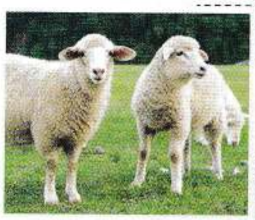

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডাঃ মোঃ গোলাম কবির
প্রকল্প পরিচালক

রচনা ও সম্পাদনায়
ডা. মোঃ আফলাক উদ্দিন ফকির, পরিচালক
ড. সৈয়দ আলী আহসান, উপ-পরিচালক
ডা. পল্লব কুমার দত্ত, উপ-পরিচালক
জিনাত সুলতানা, উপ-পরিচালক
দীপক কুমার সরকার, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর

সম্পাদনা সহযোগিতায়
ডা. মোঃ আনোয়ার সাহাদাৎ, উপ প্রকল্প পরিচালক
ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান, উপ প্রকল্প পরিচালক

প্রকাশনায়
হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

Website: www.dls.gov.bd
Email:pdhaordls@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যাঃ ৫৮৫০ কপি
প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০২১

মুখবন্ধ

সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু নিরাপদ প্রাণিজ ও আমিষ গ্রহন বৃদ্ধিকরন এবং খাদ্যে পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রমের মাধ্যমে হাওর এলাকার ৭টি জেলার ৫৩টি উপজেলার ৩৩৮ টি ইউনিয়নের ৫১,২৭৬ সুফলভোগী পরিবার প্রত্যেক্ষভাবে এবং ৪,১০,৬৪৪ পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়ন তথা হাওর এলাকার প্রাণিজ ও আমিষ দুধ, ডিম, মাংসের চাহিদা পূরণ করে প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে এবং দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে পদার্পনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ উৎপাদনকারী, ভেড়া পালন খামারি/ সুফলভোগীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসু করতে সহায়ক হিসেবে এ বুকলেটটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে প্রকল্পে ভেড়া খামারী উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

এ বুকলেটটি রচনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

ডাঃ মোঃ গোলাম কবির
প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভেড়া পালন	১
২.	ভেড়া ও অন্যান্য গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির মাংসের গড় পুষ্টি উপাদান	২
৩.	ভেড়ার জাত পরিচিতি	২
৪.	বাংলাদেশে ভেড়া পালন পদ্ধতি	৩
৫.	ভেড়ার বাসস্থান	৫
৬.	ভেড়ার খাদ্যাভাস ও খাদ্য উপাদ ও ব্যবস্থাপনা	৬
৭.	বাচ্চা ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৯
৮.	বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১০
৯.	বাড়ন্ত খাসী ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ	১০
১০.	প্রজনন যোগ্য ভেড়া পাঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ	১০
১১.	প্রজণনক্ষম/গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ	১০
১২.	ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা	১১
১৩.	ভেড়ী গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেওয়ার আদর্শ সময়ঃ	১২
১৪.	বাচ্চা ভেড়ার যত্ন	১২
১৫.	রোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার টিকা প্রদান	১৩
১৬.	ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনা	১৪

ভেড়া পালন

ভেড়া পালনের গুরুত্ব

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভেড়া পালন জনপ্রিয়। মাংস, উল ও দুধ উৎপাদনের জন্য ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে। বড় বড় বাণিজ্যিক খামারের মাধ্যমে ভেড়া পালন সম্ভব। তাছাড়া পারিবারিক পর্যায়েও ভেড়া পালন সম্ভব। ভেড়ার মাংস অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু।

ভেড়া পালনের বিশেষ দিকঃ

ভেড়া শান্ত ও ছোট প্রাণী। ফলে এদের খাদ্য ও আবাসন জনিত বিনিয়োগ এবং ঝুকি কম। ভেড়া মাংস, পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে। ভেড়া গরু ছাগলের সঙ্গে মিশ্রভাবে পালন করা যায়। একটি ভেড়া সাধারণত বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ২ টি করে বাচ্চা দেয়। পালনের জন্য ৭-১২ মাস বয়সী সুস্থ ভেড়া নির্বাচন করা উচিত। শারীরিক গঠনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ২ ধরনের ভেড়া দেখা যায়। যথাঃ একটি জাতের কান খুব ছোট ও লেজ খাট। অন্যটির কান মোটামুটি বড় ও লেজ মধ্যম আকৃতির। ভেড়ার মাংসে বিভিন্ন রকমের খনিজ লবন রয়েছে। ভেড়ার মাংস আয়রন ও কপারের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদনে আয়রন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কপার শরীরে আয়রন বিপাকে এবং লোহিত রক্তকণিকা বিশ্লেষণে সাহায্য করে। ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে। ভেড়ার মাংসে কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতি থাকে না এবং এর ফলে গ্লাইসেমিক সূচকে মাত্রা খুব কম থাকে। ভেড়ার মাংস প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। ভেড়ার মাংস ওমেগা-৩ ফ্যাট এর একটি উৎকৃষ্ট উৎস। ভেড়ার মাংসে উৎকৃষ্ট পরিমানে ভিটামিন বি-১২ এবং নিয়াসিন রয়েছে।

ভেড়া ও অন্যান্য গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির মাংসের গড় পুষ্টি উপাদানঃ

পুষ্টি উপাদান	ভেড়া	গরু	ছাগল	মহিষ	মুরগী	হাঁস
পানি%	৭৫	৭৪	৭৪	৭৯	৭৫	৭২
আমিষ	২১	২২	২২	১৯	২১	২২
চর্বি	৩	৩	৭	১	৩	৫
খনিজ	১	১	১	১	১	১
ভিটামিন-এ (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	১০	২০	১০	--	৮০	--
ভিটামিন-সি (মাইক্রো গ্রাম/১০০গ্রাম)	১০০০	১৫০০	--	--	৫০০০	--
ভিটামিন-ই (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	৫০০	৪০০	৫০০	--	২০০	--
আয়রন (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	২	৩	২	--	২	--
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	১০	১০	১০	--	১০	--
কোলেস্টেরল (মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম)	৭০	৭৬	৭০	--	৬০	১৭০

ভেড়ার জাত পরিচিতি

সারা বিশ্বে প্রায় ৯০০ জাতের ভেড়া পাওয়া যায়। দুধ, মাংস ও উল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়াকে তিনটি জাতে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১) মাংস ও অধিক বাচ্চা উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত; ২) উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত এবং ৩)দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাতসমূহ সাধারণত শীত প্রধান দেশে দেখা যায়। তবে কিছু মাংস উৎপাদনশীল ভেড়ার জাত মরু অঞ্চলেও দেখা যায়। সাফক, ডরসেট, হ্যাম্পসায়ার ইত্যাদি অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। প্রাপ্ত বয়স্ক এ সকল ভেড়ার ৯০-১৩৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। মেরিনো, চিভয়েট, ব্লু-ডু মেইন, লিংকন জাতের ভেড়া অধিক উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা প্রতি বছরে ২-৬ কেজি পর্যন্ত উল উৎপাদন করতে পারে। আওয়াসী, ইস্ট ফ্রিজিয়ান ভেড়া দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা বছরের ২১০ দিনে ৩৫০-৭৫০ লিটার পর্যন্ত দুধ উৎপাদনে সক্ষম।

চিত্রঃ সাফক জাতের ভেড়া

চিত্রঃ ডরসেট জাতের ভেড়া

চিত্রঃ হ্যাম্পসায়ার জাতের ভেড়া

চিত্রঃ চিভয়েট জাতের ভেড়া

চিত্রঃ মেরিনো জাতের ভেড়া

চিত্রঃ লিংকন জাতের ভেড়া

বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভেড়া সমূহ জাত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পেলেও এদের বিশেষ স্বকীয়তা রয়েছে। অঞ্চল ভেদে বাংলাদেশে মোট তিন ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়।

চিত্রঃ দেশী জাতের ভেড়া

চিত্রঃ দেশী জাতের ভেড়ী

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়াঃ

রাজশাহী, চাপাঁইনবাবগঞ্জ ও নাটোর এলাকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ সরু ও ছোট, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া শিং যুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ২২-৩০ কেজি এবং ভেড়ি ১৫-২৫ কেজি ওজন বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। এরা অত্যন্ত প্রজননক্ষম, সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ১-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে।

যমুনা অববাহিকার ভেড়াঃ

টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধাসহ যমুনা অববাহিকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ তুলনামুলকভাবে একটু লম্বাটে, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া পেচানো শিং যুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ি ১৫-২২ কেজি ওজন বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। এরা অত্যন্ত প্রজননক্ষম, সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ২-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের চরাঞ্চলে যেমন নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, হাতিয়া, লক্ষীপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এরা লবণাক্ত স্যাঁত-স্যাঁতে

চারণভূমিতে চরে অভ্যস্ত। এদের শিং পিছনে বাঁকানো কিন্তু পেচানো নয়। তাছাড়া চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সুন্দরবন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গারল নামে একধরনের দেশীয় ভেড়া পাওয়া যায়। এদের লেজ তুলনামূলকভাবে লম্বা এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।

বাংলাদেশে ভেড়া পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু উন্নত পশম উৎপাদন ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের ভেড়া পালন উপযোগী নয়। একারণে এদেশের আবহাওয়াতে সহনশীল দেশীয় ভেড়ার খামার গড়ে উঠেছে। ভেড়া সহজেই বিভিন্ন আবহাওয়ায় সহনশীল হওয়ায় এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অধিক হওয়ায় সম্ভবনাময় ভেড়া পালন এদেশের কিছু অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভেড়া পালন পদ্ধতি বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদে বা সামগ্রিক ভাবে ভিন্নতর। এসকল পালন পদ্ধতি কয়েক ভাবে ভাগ করা হয়।

১। আধা নিবিড় সাবসিস্টেন্স খামারঃ

এ পদ্ধতি সারাদেশেই দেখা যায়। খামারিগণ এককভাবে বা গরু-ছাগলের সাথে মিশ্রভাবে ২-৬ টি ভেড়া পালন করে। ভেড়া রাতের বেলা গরু-ছাগলের ঘরে অবস্থান করে এবং দিনের বেলা মাঠে, বাগানে রাস্তার ধারে চরে বা বেড়িবাধঁ পালন করা হয়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভূসি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এসকল খামারে ইনব্রিডিং সমস্যা বেশী।

২। সম্পূর্ণ ছেড়ে পালা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক খামারঃ

এ পদ্ধতি অনেকটা আধানিবিড় সাবসিস্টেন্স পদ্ধতির মত। এক্ষেত্রে ১৫-৪০ টি ভেড়া বাণিজ্যিকভাবে পালন করা হয়। খামারিগণ দিনের বেলা ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে, বাগানে, রাস্তার ধারে চরায়। এ পদ্ধতিতে পালনকৃত ভেড়াতে সংকর জাতের (ভারতের ছোট নাগপুরি x দেশীয় ভেড়া) ভেড়াও দেখা যায়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভূসি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বছরে ১-২ বার পশম সংগ্রহ করা হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা গেলে এ পদ্ধতিতে ভেড়া উৎপাদন অধিক লাভজনক হতে পারে।

৩। বরেন্দ্র এলাকার আধা নিবিড় বাণিজ্যিক খামারঃ

এ ধরণের খামার সাধারণত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল খামারিগন দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল খামারে সময়ভেদে ৫০-১৫০ ভেড়া প্রতিপালন করা হয়। এক্ষেত্রে ১-২ জন রাখাল ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ভেড়াকে চরানো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে। আমন ও রবিশস্য কাটার পর ভেড়া মাঠে চড়ে বেড়ায় এবং ঝরা ধান, ছোলা, খেসারী ও নতুন গজানো ঘাস খায়। বর্ষাকালে জমিতে পানি জমে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সবুজ ঘাস খায়। তাছাড়া বাগানে, ঝোপে, রাস্তার ধারেও ভেড়া চড়ানো হয়। এ পদ্ধতিতে পালিত ভেড়াকে খড় ও দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। বছরে ৩-৪ বার পশম সংগ্রহ করা হয় যা সাধারণত নিম্নমাণের কম্বল তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪। চরে সম্পূর্ণ ছেড়ে ভেড়া পালনঃ

এ ধরনের ভেড়া উপাদন পদ্ধতিতে লবণাক্ত স্যাঁত-স্যাঁতে চরে [illegible] করা হয়। ভেড়া পালনের জন্য ভেড়ার সংখ্যা ভেদে ২-৫ [illegible] সারাদিন কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত মাঠে চড়ে বেড়ায়, ঘাস [illegible] লতা-পাতা খায়। জোয়ার এবং বিক্রি হয়ে থাকে। এ পালন [illegible] দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয় না । যদিও এদের উৎপাদন[illegible] পালন পদ্ধতি লাভজনক।

৫। সমন্বিত খামার :

এ পদ্ধতিতে গরু-ছাগল এর সাথে মিশ্রভাবে ভেড়া পালন করা হয়।

৬। নিবিড় ভেড়া পালন ব্যবস্থাঃ

এ পদ্ধতিতে ভেড়া সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়। ভেড়াকে প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য, ঘাস ও পানি সরবরাহ করা হয়।

ছোট খামারের ক্ষেত্রে মাঠ থেকে ঘাস কেঁটে সংগ্রহ করা হয় কিন্তু বড় খামারের ক্ষেত্রে ঘাস চাষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ পদ্ধতি লাভজনক ও সম্ভাবনাময়। বর্তমানে দেশে এ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা গেলে ভেড়া পালনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।

ভেড়ার বাসস্থান ঃ

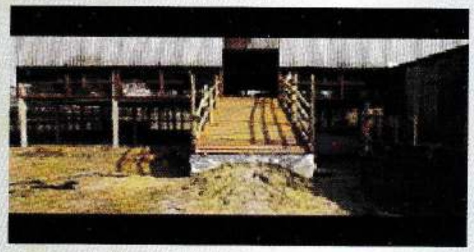

ভেড়া লালন পালনের জন্য আলো-বাতাসযুক্ত শুষ্ক স্থানে আবাসন তৈরী করতে হবে। বাসস্থান নির্মানে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে তা হলোঃ

- ঘরটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন ঘর শুষ্ক থাকে এবং প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ঘরে যাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে।
- ঘরে শীত হতে ভেড়াকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া বন্য প্রাণির আক্রমন থেকে সুরক্ষিত থাকে।
- ঘরটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা থাকে।
- ভেড়ার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঘর তৈরী করতে হবে। সাধারনত প্রতিটি ভেড়ার জন্য সম্পুর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ১০ বর্গ ফুট এবং ছাড়া অবস্থায় পালনের ক্ষেত্রে ৬-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ভেড়ার বয়স, আকার ও উদ্দেশ্য এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জায়গার পরিবর্তন করতে হয়। যেমন, সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ভেড়া লালন করতে হলে তাকে

এক্সারসাইজের জন্য অতিরিক্ত জায়গা প্রদান করতে হবে।

- ভেড়া পালনের জন্য একটি আদর্শ ঘরের মাপ হলো: ৫-৭ ফিট
- ঘরটির মেঝে মাটি থেকে কমপক্ষে ১.৫ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করতে হবে।

• ঘরের মেঝে (৬ ফুট X ৫ ফুট) ৩০ বর্গফুট, চালা (৬.২৫ ফুট X ৫.৫০ ফুট) ৩৫ বর্গফুট হবে।

• ঘরের সামনের দেয়াল (৬ ফুট লম্বা X ৫ ফুট উচ্চতা), পিছনের দেয়াল (৬ ফুট লম্বা X ৪ ফুট উচ্চতা), বাকি ২ দিকের দেয়াল (৫ ফুট লম্বা X ৪.৫ ফুট উচ্চতা) মাপের হবে।

দেয়ালের নিচের অংশ শক্ত ভাবে আবৃত করতে হবে যাতে বন্য প্রাণির আক্রমন থেকে ভেড়াকে রক্ষা করা যায় এবং উপরের অবশিষ্ট অনাবৃত অংশ তারজালি দিয়ে আবৃত করতে হবে যাতে করে পযাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে।

• এ ধরনের একটি ঘর তৈরীতে প্রায় ৬-৭ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো বাঁশ, টিন, কাঠ তারজালি। উল্লেখ্য যে ভেড়ার ঘরে যাতায়াত করার জন্য দরজার সাথে একটি বাশেঁর সিড়ি সংযোজন করতে হবে।

তবে মুক্তভাবে (সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায়) পালনের ক্ষেত্রে ভেড়া প্রতি জায়গা আরো কম হলেও চলে। কেননা এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাতে ভেড়া ঘরে অবস্থান করে। আমাদের দেশে এ ধরনের খামারের সংখ্যা বেশী। এসকল ভেড়া সারাদিন উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করে, সবুজ ঘাস, পাতা, গুল্ম খায় এবং রাতে খামারির বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে। যাদের চাষযোগ্য জমির অভাব রয়েছে তারা সাধারণত এ ধরনের পারিবারিক ভেড়ার খামার স্থাপন করে থাকে।

ভেড়ার খাদ্যাভাস ও খাদ্য উপাদন ও ব্যবস্থাপনাঃ

ভেড়ার খাদ্যাভাসঃ

ভেড়া গরু-ছাগলের মতই মাঠে চরে লতাপাতা, ঘাস, সাইলেজ, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। এরা সহজেই নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয় এমনকি প্রতিকূল পরিবেশে শুধুমাত্র খড় ও নাড়া খেয়েও ভালোভারে বেঁচে থাকে।

খাদ্য উপাদানঃ

ভেড়ার মূল খাদ্য উপাদান হলো সবুজ ঘাস। তাছাড়া এরা সবুজ ঘাস এর পাশাপাশি দানাদার খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে।

ঘাস উৎপাদনঃ

বাংলাদেশের অনেক এলাকায় গবাদি প্রাণির ঘনত্বের ও তুলনায় চারণ ভূমির পরিমান কম থাকায় ঘাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাড়ির আঙ্গিনার আশে-পাশের পতিত জমি, রাস্তার পাশের অব্যবহৃত

ঘাস চাষের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল জাতের ঘাস যেমন- নেপিয়ার, পারা, গিনি, জাম্বু জাতীয় ঘাস চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া ইপিল-ইপিল, ধইঞ্চা, অড়হর জাতীয় গুল্মও ভেড়া খেয়ে থাকে। উচ্চ ফলনশীল জাত **হিসেবে নেপিয়ার (হাইব্রিড) ঘাস চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হলোঃ**

ক্রঃ নং	বৈশিষ্ট্য	
১	মাটির ধরণ	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের যে কোন মাটিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করা যায়। এমনকি পাহাড়ী ঢাল ও সমুদ্রতীরবর্তী জমিতেও নেপিয়ার চাষ করা যাবে।
২	জমি তৈরী	উত্তমভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে শুরুতে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০-২৫ টন গোবর/জৈব সার প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হবে। তাছাড়া ইউরিয়াঃটিএসপিঃএমপি সারের মিশ্রণ (৫০ঃ৭০ঃ৩০ কেজি) ১৫০ কেজি/হেক্টর হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।
৩	রোপনের সময়	নেপিয়ার ঘাসের কাটিং বছরের যে কোন সময়েই লাগানো যেতে পারে তবে ফাল্গুন-চৈত্র মাস উত্তম।
৪	কাটিং এর সংখ্যা ও লাগানোর দুরত্ব	হেক্টর প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং। লাইন থেকে লাইন ৭০ সে.মি. এবং কাটিং-কাটিং দুরত্ব ৩৫ সে.মি.।
৫	সার প্রয়োগ	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর ৫০-৭০ কেজি ইউরিয়া/হেক্টর এবং প্রতিবার ঘাস সংগ্রহের পর একই হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।
৬	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।
৭	ঘাস কাটার সময়	সাধারণত ৩০-৪৫ দিন (গ্রীষ্ম কাল), ৫০-৬০ দিন (শীতকাল)
৮	বছরে কাচা ঘাসের উৎপাদন	১৫০-২০০ টন/হেক্টর
৯	পুষ্টিমান	প্রতি কেজি ঘাসে শুষ্ক পদার্থ - ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ - ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ২৫ গ্রাম এবং বিপাকিয় শক্তি ২.০ মেগাজুল।
১০	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরী

দানাদার খাদ্যঃ

ভেড়াকে সাধারণত সবুজ ঘাসের পাশাপাশি খাদ্য হিসেবে গমের ভুষি, চালের কুড়া, মাসকলাই, খেসারী, মটর ইত্যাদির ভুষি এবং বিভিন্ন ধরনের খৈল, ফিসমিল বা মাছের গুড়া, খনিজ লবন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির মিশ্রণ দানাদার খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা টেবিলে দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	বাচ্চা ভেড়া (৩-৬ মাস)	বাড়ন্ত ভেড়া (৭-১৫মাস)	বয়স্ক ভেড়া (১৫ মাস+)
চাল/গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩০	১৫	১০
ডালের গুড়া	৫	-	-
গমেরভুষি/চালের কুড়া	২৯	৪৫	৫০
মাসকলাই/খেসারী ডালের ভুষি	৫	১৫	১৫
খৈল (তিল/সয়াবিন/সরিষা)	২৫	২০	২০
শুটকি মাছের গুড়া/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.৫	১	১
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট/ঝিনুকের গুড়া	২	২	২
খনিজ লবন	১	১.৫	১.৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০

ভেড়ার খাদ্য হিসাবে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্রঃ

খড়ের সাথে পরিমাণ মত ইউরিয়া ও মোলাসেস মিশ্রিত করে ভেড়াকে খড়ের পরিবর্তে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র খাওয়ানো যেতে পারে। ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

মিল্ক রিপ্লেসার/বিকল্প দুধের উপাদানঃ

মা ভেড়ী হতে একাধিক বাচ্চা জন্মালে বা মা ভেড়ী হতে দুধ উৎপাদন কম হলে বাচ্চা ভেড়াকে বিকল্প দুধ সরবরাহ করতে হয়। তাছাড়া বিকল্প দুধ বাচ্চা ভেড়াকে সম্পূরক খাদ্য হিসাবেও সরবরাহ করা যেতে পারে। বিকল্প দুধের উপাদান সমূহ টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

উপাদান	পরিমাণ %
গুড়া দুধ	৭০
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	২০
সয়াবিন তৈল	৭
খনিজ লবন	১.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট/ঝিনুকের গুড়া	১.৫
ভিটামিন - মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫
সর্বমোট	১০০

উক্ত মিশ্রণের ১ ভাগের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশাতে হবে। পানিকে অন্তত ৫ মিনিট ফুটিয়ে পুণরায় কুসুম গরম অবস্থায় ঠান্ডা করে বিকল্প দুধ তৈরী করতে হবে। বাচ্চা জন্মের পর থেকে প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম করে দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।

বাচ্চা ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

গর্ভাবস্থা হতেই বাচ্চার পুষ্টি ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। ভেড়ার গর্ভধারণকাল ১৪৫-১৪৮ দিন। গর্ভের শেষ ২ মাস মা ভেড়াকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। এতে বাচ্চা সবল ও পুষ্ট হয় এবং জন্মের পর পর্যাপ্ত দুধ পায়। জন্মের সাথে সাথে বাচ্চার মুখ ও নাক শুকনো পরিষ্কার সূতি কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। শাল দুধ জন্মের আধা ঘন্টার মধ্যে খাওয়ানো হলে ইহা অধিক কার্যকর হয়। শাল দুধ বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিয়ে থাকে। একাধিক বাচ্চা জন্মালে সকল বাচ্চাই যেন শাল দুধ পায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বয়সভেদে বাচ্চার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ টেবিলে উপস্থাপন করা হলে।

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)			
		মায়ের দুধ (সাকলিং/বিকল্প দুধ)	দানাদার খাদ্য	কঁচি ঘাস/লতা-পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস
০	১.৫	২৯০	-	-	-
১	২.০	৩৬০	-	-	-
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্য পরিমাণ	-
৩	২.৮	৪৬০	১০	সামান্য পরিমাণ	-
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমাণ	-
৫	৩.৬	৫৬০	২০	১০০	-
৬	৪.০	৬০০	২৫	১৫০	সামান্য পরিমাণ
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১৫০	সামান্য পরিমাণ
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১৫০	২০
৯	৫.০	৫৫০	৪০	১৭৫	৩০
১০	৫.৪	৫০০	৫০	২০০	৩০
১১	৫.৭	৪৫০	৭৫	২৫০	৩০
১২	৬.১	২০০	৯০	৩০০	৪০
১৩	৬.৫	১০০	১৫০	৩৫০	৫০
১৪	৬.৯	১০০	২০০	৪০০	৭০
১৫	৭.৩	-	২০০	৪৫০	৭০
১৬	৭.৭	-	২০০	৫০০	১০০

- জন্মের পর বাচ্চার দৈনিক ৩০০ মিলি শাল দুধ প্রয়োজন।
- প্রতিটি বাচ্চাকে ৪ সপ্তাহ বয়সে ৫০০ মিলি করে দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চার দুধ নির্ভরশীলতা কমাতে ২ সপ্তাহ থেকে সামান্য পরিমাণে কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

বাড়ন্ত ভেড়া বলতে ৪-১৫ মাস বয়সী ভেড়াকে বুঝানো হয়। ভেড়া এ সময়ে পুষ্টি সরবরাহ কম পায়। কেননা, এ সময়ে মা ভেড়া হতে দুধ পায় না এবং নিজস্ব খাদ্য গ্রহণের হারও কম থাকে। ভেড়া লালন পালনে এ সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসময়েই ভেড়ার মূল শারীরিক গঠন হয়ে থাকে। এ সময়কালে পর্যাপ্ত পুষ্টি না পেলে ভেড়ার প্রকৃত বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, উৎপাদনশীলতা কমে এমনকি মৃত্যু ঝুকি বেড়ে যেতে পারে। ফলে ভেড়া পালনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে।

বাড়ন্ত খাসী ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

সাধারণত ৩ মাস বয়স পূর্তিতে ভেড়ার বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হয়। খাসী ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা শুরু হয় ৪র্থ মাস হতে। খুজাকৃত খাসী ভেড়াকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা গেলে দৈনিক ৬০ গ্রাম করে ওজন বৃদ্ধি হয়। ফলে ১ বছর বয়স পূর্তিতে গড় ওজন প্রায় ১৮-২০ কেজিতে উন্নীত হয় যা বাজারজাত করণের জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়।

প্রজনন যোগ্য ভেড়া পাঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

প্রজনন যোগ্য পাঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি খামারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেনন পাঠা ভাল হলে প্রজণনক্ষম ভেড়া হতে ভালো বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব। তাছাড়া সঠিক পাঠা নির্বাচন করা গেলে ভেড়ার জিনগত উন্নয়ন সম্ভব। প্রজনন কার্যক্রমে ব্যবহার হবে এমন পাঠাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দৈনিক ৩৫০-৫০০ গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার (টেবিল) খাদ্য প্রদান করতে হবে। গাঁজানো ছোলা খাওয়ানো হলে পাঠার প্রজনন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে। এ লক্ষ্যে পাঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা খাওয়ানো যাবে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার দেয়া যাবে না। তাছাড়া বছরে ২ বার ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে কৃমিনাশক ও ভিটামিন প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভিটামিন এ.ডি.ই. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রজননক্ষম/গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

আমাদের দেশের ভেড়া সাধারণত বছরে দুইবার বাচ্চা প্রদান করে থাকে। স্ত্রী ভেড়া ৬-৭ মাস বয়সেই প্রজণনক্ষম হয়ে উঠে। ভেড়ার গর্ভকাল ১৪৫-১৪৮ দিন। প্রথম বাচ্চা প্রদানের ১ মাস পরই পূনরায় ভেড়া গরম হয় অর্থাৎ আবার গর্ভধারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গর্ভধারণের প্রথম ১২ সপ্তাহ সাধারণত তুলনামুলক কম পুষ্টির প্রয়োজন হয় কিন্তু যেহেতু এরই মধ্যে পুনঃগর্ভধারণ হয় এবং দুধ উৎপাদন করতে হয় তাই পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হয়।

তাছাড়া গর্ভাবস্তার শেষ ৮ সপ্তাহ গর্ভস্থ বাচ্চার অতিদ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ফলে ভেড়ার অধিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

মুক্তভাবে ছেড়ে পালা ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- দিনের বেশীরভাগ সময়ের জন্য মাঠে, বাগানে চড়াতে হবে।
- সম্পূরক খাবার হিসেবে ভাতের মাড়, দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ঘাসের অভাব দেখা দিলে কাঁঠাল পাতা, বাবলা পাতা, ইপিল-ইপিল সহ অন্যান্য ঘাস সরবরাহ করতে হবে।
- বাচ্চার দুধ নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বাচ্চাকে কঁচি নরম ঘাস সরবরাহ ও অভ্যস্ত করতে হবে।
- দুগ্ধবতী ভেড়াকে ওজন ভেদে ১৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার খামার লাভজনক ও টেকসই করতে হলে সঠিক পাঠা নির্বাচন, ভেড়ী নির্বাচন, প্রজনন বয়স নির্ধারন, পালে ভেড়ী ও পাঠার অনুপাত নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক পাঠা ভেড়া নির্বাচনঃ

সঠিক পাঠা নির্বাচন একটি ভেড়ার খামারের মৌলিক বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়া পাঠা নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রতি প্রজণনে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়। একটি পাঠা ভেড়া নির্বাচনে যে

সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় পাঠার বয়স ১২-১৪ মাস হতে হবে।
- নির্বাচিত পাঠ অধিক উৎপাদনশীল বংশের হতে হবে। অর্থ্যাৎ তার মা, দাদী ও নানীর অধিক উৎপাদনশীলতার ইতিহাস ও উৎপাদিত বাচ্চাতে কম মৃত্যুর হার (৫% এর কম) থাকতে হবে।
- নির্বাচিত পাঠা প্রজনন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে।
- পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- পাঠা তুলনামুলকভাবে আকারে বড় ও সোর্য বীর্যশালী হওয়া উচিত।

সঠিক ভেড়ী নির্বাচনঃ

বাণিজ্যিক খামারে সঠিক ভেড়ী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়ী নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রজননে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়।

একটি ভেড়ী নির্বাচনে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় ভেড়ীর বয়স ৯-১৩ মাস হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হতে হবে। অর্থ্যাৎ তার মা, দাদী ও নানীর অধিক উৎপাদনশীলতার ইতিহাস ও উৎপাদিত বাচ্চাতে কম মৃত্যুর হার (৫% এর কম) থাকতে হবে। তাছাড়া মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান ও প্রতিবারে ২ টি বাচ্চা প্রদানের ইতিহাস থাকতে হবে।

- নির্বাচিত ভেড়ী প্রজনন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে।
- ওলান সুগঠিত, অধিক দুধ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- শরীর অনেকটা ত্রিকোনাকৃতি ও পা সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- ভেড়ী তুলনামুলকভাবে আকারে বড় হওয়া উচিত।

ভেড়ী গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেওয়ার আদর্শ সময়ঃ

- ভেড়ী গরম হলে সোজাভাবে দাড়িয়ে থেকে লেজ বাঁকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে।
- ভেড়ীর যোনীদ্বার লাল ও ফোলা হবে এবং যোনীদ্বার দিয়ে সাদাটে মিউকাস বের হবে।
- ভেড়ীর খাওয়া দাওয়া কমে যায়, পাঠার গা ঘেষে অবস্থান করে, ডাকাডাকি করে।
- আমাদের দেশে ভেড়ার কৃত্রিম প্রজনন ইতোমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত দেশে প্রাকৃতিক পদ্ধতির প্রজনন কার্যক্রমই অধিক। তবে আবদ্ধভাবে ভেড়া পালন পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজনন চালু করা জরুরী।
- ভেড়ী গরম হওয়ার ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করানো জরুরী।
- সঠিক সময়ে পাল না দিলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে। তাছাড়া প্রজনন রোগ থাকলেও ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে।
- পাঠার ত্রুটিপূর্ণ শুক্রানু ও ভেড়ীর ত্রুটিপূর্ণ ডিম্বানুর কারণে ডিম নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে।
- অপুষ্টিজনিত কারণেও ডিম নিষিক্ত না হলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে। তাছাড়া হরমোণের অসামঞ্জস্যতার কারণে বা অতিরিক্ত গরম ও অসহনীয় অবস্থার কারণেও ফার্টিলাইজেশন ব্যাহত হলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে।
- সুতরাং সঠিক সময়ে পাল দেওয়া ও প্রজনন রোগের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনে পাঠা ও ভেড়ী খামার থেকে বাতিল করতে হবে।
- বারে বারে প্রজননে একই পাঠা বা একই পাঠার বীজ ব্যবহারে বিরত থাকতে হবে। ফলে ইন-ব্রিডিং সমস্যা দূর হবে।
- প্রজনন ব্যবস্থাপনায় ভাল পাঠা ও ভাল ভেড়ী নির্বাচন করে সিলেকটিভ ব্রিডিং করা গেলে জাত উন্নয়ন করার মাধ্যমে ভেড়ার খামার অধিক লাভজনক ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

বাচ্চা ভেড়ার যত্নঃ

- বাচ্চা প্রসবের সময়ে গর্ভবতী ভেড়ীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাস চলাচল করে এমন শুকনো পরিবেশে রাখতে হবে।
- বাচ্চার জন্মের পর মা ভেড়ী যাতে বাচ্চার শরীর চেটে পরিষ্কার করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। কেননা, এতে বাচ্চার শ্বাস-প্রশ্বাস শুরুর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।
- পরিষ্কার সুতি কাপড় ব্যবহার করে বাচ্চার নাক ও মুখ পরিষ্কার করতে হবে। বাচ্চা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাল দুধ পান করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রসব পূর্ববর্তী, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনাঃ

• গর্ভধারণের শেষ সপ্তাহে ভেড়ীর বিশেষ যত্নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

• এ সময় আবদ্ধ অবস্থায় পালনকৃত ভেড়ীকে মেটারনিটি প্যান বা প্রসব ঘরে রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে

• ছাড়া অবস্থায় চরে খাওয়া ভেড়ীকে গর্ভাবস্থার শেষ ২ সপ্তাহ বিশেষ নজরে রাখতে হবে

• এ সময়টাতে কোনভাবেই ভেড়ীকে পাঠার কাছাকাছি রাখা যাবে না

• বাচ্চা প্রসবের লক্ষণ (প্রসব ব্যাথা, উঠ-বস করা, যোনীদ্বার ফুলে যাওয়া, যোনীদ্বার দিয়ে পাতলা স্বচ্ছ মিউকাস দেখা, ওলান দুধে ভরে উঠা) দেখা গেলে কাছাকাছি অবস্থান করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জীবানুমুক্ত কাঁচি, আয়োডিন মিশ্রণ, সূতা প্রস্তুত রাখতে হবে

• বাচ্চা জন্মদানকালে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে বা বাচ্চা আটকিয়ে গেলে দ্রুত সময়ের মধ্যে ভেটেরিনারিয়ানের সাহায্য নিতে হবে

• বাচ্চা জন্মানোর পর অতিদ্রুত বাচ্চার নাক ও মুখ পরিষ্কার সূতি কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে

• বাচ্চাকে ভেড়ী কাছাকাছি রাখতে হবে যেন ভেড়ী বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করতে পারে

• একাধিক বাচ্চা জন্মালে প্রতিটির ক্ষেত্রেই একই ভাবে মুখ ও নাক পরিষ্কার করতে হবে

• বাচ্চা জন্মানোর পর অতিদ্রুত বাচ্চার নাক ও মুখ পরিষ্কার সূতি কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে

• বাচ্চাকে ভেড়ী কাছাকাছি রাখতে হবে যেন ভেড়ী বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করতে পারে

• একাধিক বাচ্চা জন্মালে প্রতিটির ক্ষেত্রেই একই ভাবে মুখ ও নাক পরিষ্কার।

• বাচ্চা জন্মানোর পর যতদ্রুত সম্ভব প্রতিটি বাচ্চা যাতে শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

• বাচ্চা জন্মানোর পর ভেড়ীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন মেশানো পানি সরবরাহ করতে হবে

• প্রসব পরবর্তী গর্ভফুল পড়েছে কিনা (৬-১২ ঘন্টার মধ্যে) তা খেয়াল রাখতে হবে। না পড়লে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ নিতে হবে

• এসময়ে ভেড়ীকে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার দেয়া গেলে আন্তঃপ্রজনন দূরত্ব কমানো সম্ভব হবে

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় টিকা প্রদানঃ

• খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন।

ভেড়ার টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলোঃ

রোগ	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৯ মাস	মন্তব্য
ক্ষুরা রোগ	১ম ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)			১ম ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)	
পিপিআর		১ম ডোজ			
পক্স			১ম ডোজ		

নোটঃ একথাইমা রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩য় দিনে এবং ১০-১৪ তম দিনে পুনরায় টিকা প্রদান করা যেতে পারে
এন্টারোটক্সিমিয়া রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬ মাস বয়সে টিকা প্রদান করা যেতে পারে
ক্ষুরা রোগের টিকা প্রতি ৬ মাস পর পর প্রদান করতে হবে
যেহেতু খামারের সকল ভেড়ার বয়স এক নয়, সে কারণে টিকা প্রদানের কর্মসূচি এক মাস পর্যন্ত আগ-পিছ করা যাবে

ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনা

এনথ্রাক্সঃ

এনথ্রাক্স হলো ব্যাসিলাস এনথ্রাসিস নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন জনিত রোগ। এ রোগের ব্যকটেরিয়া স্পোর আকারে মাটিতে থাকে। তাছাড়া চারণভূমিতে কোন আক্রান্ত ভেড়া বা অন্য প্রাণি বিচরণকালে মৃত্যুবরণ করলে তার সঠিকভাবে ডিসপোজাল না করলে মাটিতে এবং ঘাসে এ রোগের স্পোর এর পরিমান বেড়ে যায় যা পরবর্তীতে অন্য ভেড়া ভক্ষণ করলে এই স্পোর ভেড়াতে রোগ তৈরী করতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মরে যেতে পারে।
- ভেড়ার গায়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫-১০৬ ডিগ্রী ফারেণহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
- মৃত্যুর পর নাক, মুখ, পায়খানা ও প্রস্রাব রাস্তা দিয়ে কালো জমাটবিহীন রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হতে পারে।
- আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। অন্য ভেড়া থেকে আলাদা হয়ে ঝিমাতে থাকে এবং হঠাৎ মারা যেতে পারে। কোন কোন সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে খিচুনি দিয়ে মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

- যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে খামারের সকল ভেড়াকে প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

স্ট্রাক, ব্ল্যাক এবং ব্রাক্সি

স্ট্রাক, ব্ল্যাক এবং ব্রাক্সি ক্লোসট্রিডিয়াল ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন জনিত রোগ। ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজিন্স টাইপ সি, ক্লোসটিডিয়াম নোভি টাইপ বি এবং ক্লোসট্রিডিয়াম সেপটিকাম জীবানু সংক্রমনের কারণে যথাক্রমে স্ট্রাক, ব্ল্যাক এবং ব্রাক্সি রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মারা যেতে পারে
- স্ট্রাক হলে ভেড়া বসা অবস্থা থেকে উঠতে পারে না, চার পা চারদিকে ছড়িয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে মাথা ও থুতনি নিচু করে শুয়ে থাকে, দাত কিড়মিড় করে, মুখে ফেনা দেখা যায়, শরীর অসাড় হয়ে যায় এবং রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হতে পারে
- ব্লাক ডিজিজ হলে ভেড়ার লিভার নষ্ট হয়ে যায় ফলে খুব সহজেই ভেড়া মারা যায়
- ব্রাক্সি হলে ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যাথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে পরে, ঝিমায় এবং মারা যায়
- আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। পাতলা পায়খানা হয়। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

- যেহেতু এসকল রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম, তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে

রোগ প্রতিরোধঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা
- ভেড়াকে পরিমিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা।
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- টিকা প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে টিকা প্রদান করা যেতে পারে

ল্যাম্ব ডিসেন্ট্রি

ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স টাইপ বি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমনের কারণে এ রোগ হয়। সাধারণত ১-৪ দিন বয়সি বাচ্চাতে বেশী দেখা যায় তবে ৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এ রোগ হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুর হার ২০-৩০%।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই বাচ্চা ভেড়া মারা যেতে পারে।
- দুধ খাওয়া অবস্থায ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যাথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে, আমাশয় হতেও পারে না ও হতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

• যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম, তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- মা ভেড়ার ওলান পরিষ্কার রাখতে হবে।
- বাচ্চা ভেড়ার বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

টিটেনাস

ক্লোসট্রিডিয়াম টিটানি নামক ব্যকটেরিয়া সংক্রমনের কারনে এ রোগ হয়। সাধারণত গভীর ক্ষতে এ রোগের জীবাণু সংক্রমণ শুরু হয়।

ভড়ার বাচ্চাকে খাসী করনের সময় টিটেনাস টক্সয়েড টিকা প্রদান না করলে এ রোগ দেখা দেয় সে ক্ষতস্থানে।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত আক্রান্ত ভেড়ার বিভিন্ন অংশের মাংশপেশী শক্ত হয়ে যায়
- মাংসপেশীর খিচুনি, প্রস্রাব পায়খানা না হওয়া, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ধীরে

চিকিৎসাঃ

• এ রোগের চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় না, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- ক্যাসট্রেশন বা যেকোন অস্ত্রপাচার করার পূর্বেই টিটেনাস টক্সয়েড প্রদান করতে হবে।
- বাচ্চা ভেড়ার বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ভেড়ার বসন্ত (শীপ পক্স)

ভেড়ার ভাইরাস জনিত রোগের মধ্যে শীপ পক্স অন্যতম। এ রোগে বাচ্চা ভেড়াতে মৃত্যু হার অনেক বেশী। এ রোগ সহজেই এক ভেড়া হতে অন্য ভেড়াতে ছড়ায়।

লক্ষণঃ

- বাচ্চা ভেড়াতে জ্বর, ঝিমুনী, নাক ও মুখ দিয়ে পানি পড়া।
- কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে।
- বয়স্ক ভেড়ার পায়ুপথ, দুধের বাটে, মুখ গহবরে, কানে গুটি উঠতে দেখা যায়।

চিকিৎসাঃ

এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক, ব্যাথানাশক ও এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

পিপিআর

পিপিআর রোগটিতে সাধারণত ছাগলে প্রাদুর্ভাব বেশী হয়ে থাকে। ভেড়াতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কম দেখা যায়। এরোগে আক্রান্ত ভেড়াতে পাতলা পায়খানা, নাক দিয়ে তরল বের হওয়া, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৬-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উন্নীত হওয়া এবং শ্বাস কষ্ট দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা প্রদান না করলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটাকে থ্রি ডি ডিজিজও বলা হয়।

চিকিৎসাঃ

এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সণাক্ত করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক, স্যালাইন ও এন্টিবডি জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

ক্ষুরা রোগঃ

এফএমডি ভাইরাস জনিত দ্বিধাবিভক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণির এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত গরু/ছাগলের পাশাপাশি ভেড়াতেও এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত ভেড়াকে প্রথমদিকে খুড়িয়ে হাটতে দেখা যায়। পরবর্তীতে মুখে, ডেন্টাল প্যাডে, ক্ষুরার মাঝখানে ফোসকা পড়তে দেখা যায়।

চিকিৎসাঃ

এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া আক্রান্ত স্থান ৪% সোডি বাই কার্ব দিয়ে ধৌত করে সালফোনিলামাইড জাতীয় পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যেন মাছি বসতে না পারে।

প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

অন্যান্য ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস জনিত রোগের মধ্যে নিউমোনিয়া, ম্যাসটাইটিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগ যা ভেড়াতেও সংক্রমিত হতে পারে। এ সকল রোগের সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা হলে ভেড়া সুস্থ হয়।

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়